অ্যালান পোর বিড়াল, ছায়ারাত্রি
নাসরীন জাহান

সে দেখছে, দেয়াল। সেখানে কন্যার আঁকিবুঁকি। এত বেশি শাদা, প্রথমে মনে হত নিঃশ্বাস পড়লেই দাগ বসে যাবে। আঁকিবুঁকি ছবি দেখে, তার মনে হল সুন্দর মুখখানি কেউ আগুনে ঝলসে দিয়েছে। এখন বিছানায় বসে অথবা শুয়ে দেয়ালে তাকানো মানে গলিত মুখ দেখা। প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে কন্যার মুখোমুখি হলে সে দেখে, পাখির চোখের মতো নিষ্পাপ দু'টি চোখে ভয়।
সুবিশাল ক্রোধ নিয়ে কন্যার ভয়ার্ত চোখের সামনে সে কেমন অসহায় হয়ে পড়ে।
মেয়েটাকে বকছ কেন? বলে তার স্ত্রী কন্যাটিকে টেনে তার সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।
আশ্চর্য! বকেছি নাকি? তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু প্রশ্নের আগে নিজেই সন্দিহান হয়ে ওঠে, হয়তো শব্দ করেছি, হয়তো চড়েছে কণ্ঠ, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভেবেছি, আমি শুধু রাগ নিয়ে শিশুটির সামনে দাঁড়িয়েছি, কিচ্ছু বলিনি।
মেয়েটিকে ডেকে বড়ো জানতে ইচ্ছে করে তার, কী সেই বিকট শব্দ সে উচ্চারণ করছে যাতে তার শিশু চোখ কালো ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল?
রাত গভীর হতে থাকে।
স্ত্রী আজ কন্যার সঙ্গে শুয়েছে। আর কন্যা তার প্রিয় কালো বিড়ালটিকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়েছে। ঘোর অপছন্দ তার কালো বিড়াল। চোখ পড়লেই শিরশির করে শরীর। আশ্চর্য স্ত্রীর স্বভাব। তেমনই একটি বিড়ালের কালো বাচ্চাকে এনে কন্যাকে দিয়ে পোষ মানিয়েছে। বলে, অপছন্দ না ছাই। আসলে ভীতু লোক তো! কালো বিড়াল ভয় পায়। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না। স্ত্রী, সন্তানকে আপন করতে সে মনে মনে অনেক চেষ্টা করেছে, বিড়ালটির দিকে হাত বাড়াতে... কিন্তু এক অশরীরী ঘিনঘিনে ভয়... এছাড়া সে করবেই বা কী। কিছু দূর আগাতেই অ ভূত তাচ্ছিল্যে কন্যা তার সামনে থেকে বিড়ালটিকে নিয়ে চলে যায়। এ ঘরে আজও সে একা।
সারাঘরে রাজ্যির আলো। ঘরের কোণের শ্যাডল্যাম্প থেকে ডিমের কুসুম ভেঙে পড়ছে। সামনে ধোঁয়া মরতে থাকলে তার চেতনা ফেরে।
আধপোড়া সিগ্রেটের লম্বাটে ছাই আগুনকে শেষ চুমু খেয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ছে। অ্যাশট্রেতে বাকিটা গুঁজে সে নিষ্পলক চেয়ে থাকে সেই দেয়ালের দাগগুলোর দিকে। এ্যাদ্দিন সে ভেবে এসেছে, আমারই কন্যা, আমার রক্তস্রোত আর হৃদস্পন্দনের শব্দের মাঝে যার বৃদ্ধি, সামনে পিস্তল দাঁড়ালে এই পৃথিবীতে আমি একমাত্র যার জন্য অকপট প্রাণ দিতে পারি, যে আমার হৃৎপিণ্ডের পরিপূরক, তাকে ভালবাসায় কোনও প্রমাণ দিতে হবে না, তাকে তো যা খুশি বলা যায়, তার প্রতি প্রতিদিনের অবিচার করা যায়, সে তাই নিশ্চিন্ত ছিল, অন্তত এই জায়গায় তাকে কখনও কোনও ভান করতে হবে না। মেয়েটি ঘুমিয়ে গেলে, তার ঘুমন্ত মুখে প্রতিদিন সে দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মায়া। সেই নিদ্রাতুর মুখে সে যখন আচ্ছন্নের মতো চুমু খেয়েছে, কখনও মনে পড়েনি, এই স্পর্শের একভাগও তার জাগ্রত কন্যাকে করা হয়ে ওঠে না। তার মনে হয়েছে, তাতে কী, মেয়ে তো বঞ্চিত হচ্ছে না, আমার ভেতর ফুঁড়ে যখন অনুভব ঠেলে ওঠে, আমি তখন তাকে কানায় কানায় আমার গভীর আন্তরিক স্পর্শ তাকে দিচ্ছি। তার স্ত্রী যখন কন্যার জাগ্রত মুখ অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিতে থাকে, তখন সে নিজের প্রেমের সঙ্গে কখনও এই একটি জায়গায় ভালবাসাটা দেখিয়ে করতে হবে।
এক সময় ধমক দিলে মেয়েটি কাঁদতে থাকত, অথবা তাকে উল্টো ধমক দিত, সে সম্পর্কটাকে এই রকমই নির্ভয়, আন্তরিক জেনে এসেছে। আজ হিসেব করে সে খুঁজে দেখে, সর্বশেষ সে রকম ঘটনার পর মাঝখানে আরও অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এই মাঝখানের সময়টা সে উন্মত্তের মতোন

কাটিয়েছে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়। সে গভীর রাতে ঘরে ফিরে বিছানায় মুখ থুবড়ে থেকে ফের একটি কাক কা করে উঠলেই বিছানা থেকে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে মেয়েটিকে তখন তার সেইভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি। মাঝখানের এই সময়টায় যখনই সে একচিলতে নিঃশ্বাস নেয়ার সময় পেয়েছে, সে নিঃশ্বাস নেয়নি, বরং ভেবেছে কন্যাটির কথা, তার মনে হয়েছে মেয়েটির আগামী ভবিষ্যৎ সুন্দর করার জন্য আমি আমার সুস্থতাকে কাজে লাগাচ্ছি। সত্যিই, সে সেই সময়টায় কোনও দিন, এক মুহূর্ত নিজেকে নিয়ে ভেবে ওঠার সময় পায়নি। স্ত্রী ভুল বুঝেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা দূরে সরে গেছে। ও একটা মেশিন হয়ে গেছে, বলেছে কেউ কেউ। যে বিশ্রী কাজে অর্থ ছাড়া কিচ্ছু আসে না, তাকে তার স্ত্রী বিশেষিত করেছে ওটা তোমার নেশা বলে। কিচ্ছু কানে নেয়নি সে, কোনও অভিযোগ গ্রাহ্য করেনি, তার মনে হয়েছে যে কাজের পাটাতনে নিজেকে বলি দিয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে যায়, যার জন্য কাজ, অন্তত তার কাছে বিষয়টার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে না।

ফের সিগ্রেট ধরায়।

বারান্দায় আসে। কুণ্ডলী পাকানো শীতের জটচুল খুলে ধূমায়িত বাতাস আসে। সে দেখে, রাতের খণ্ড খণ্ড বাতিগুলো, যার নিচ দিয়ে বহু মুহূর্ত সে ফিরেছে, কিন্তু কখনও প্রবল শ্রান্তির কারণে যা তার কখনও দেখা হয়ে ওঠেনি।

স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে। আত্মনিমগ্নতার মধ্যে স্ত্রী প্রতিদিন বাঁচার জন্য আলাদা জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছে। দু'জনের কথা হয়েছে খুব কম। দু'জনের জীবনযাপন প্রাত্যহিকতার সীমাহীন দূরত্ব থাকায় কেউ সহসা আর কথা খুঁজে পায়নি। কখনও এমন যন্ত্রণাকর অবস্থাও তৈরি হয়েছে, ঘরের লজ্জাকর স্তব্ধতা ভাঙতে সে স্ত্রীর মন উপযোগী বিষয় খুঁজে খুঁজে দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করেছে।

যিনি কোনও দিন তাকে সেইভাবে অভিযোগ করেননি, তিনি তার বাবা। বাবা অভিযোগ করেছেন, এখনও করেন সে সময় দেয় না, যথেষ্ট অর্থ দেয় না, এই বলে অভিযোগ করে তিনি মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। তখন তার মনে হয়েছে, এই বাবাই তো, যিনি পিস্তলটা সামনে এলে আমার সামনে বুক পেতে দাঁড়াবেন! যেহেতু এটা সে জানে, তখন তার মনে হয়, ঠিক আছে, তিনি বোকার মতো তুচ্ছ জাগতিক বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুক পুত্রের প্রতি তার পৃথিবী-সমান প্রেম, আমি তাকে কোনও দিন এই বেদনা নিয়ে মরতে দেব না, আমি তাকে ভুল বুঝেছি।

দু'জন দুই পরিবারে বেড়ে ওঠে এক সংসারের নিচে আশ্রয় নেয়া দুই অনুভবের মানুষের প্রেম কী করে প্রবল নিঃস্বার্থ হয়? এক বিছানায় ঘুমানোর চর্চার মতো স্বামী-স্ত্রী একের পর এক প্রমাণের চর্চা করে যায়। সে ভাবে ধরা যাক আমি এক মাস কিছুই করছি না, এক মাস ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, আমার স্ত্রী কি তার কোমল আঙ্গুলগুলি নিয়ে আমার মাথার কাছে দাঁড়াবে?

অথবা বিষয়টা উল্টো হল আমাকে কিচ্ছু না বলে আমার স্ত্রী সাতদিনের জন্য নিজের ইচ্ছেমতো কোথাও বেড়াতে গেল, সাতদিন পর আমি কি উদ্ভাসিত মুখে তার জন্য দুয়ার খুলে অপেক্ষা করতে থাকব? বিষয়গুলো যখন এই রকম, কাঁচা ইটের ভাঁজে ভাঁজে সিমেন্ট ঢোকানোর মতো প্রতিদিন নির্মাণের, এই নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে লাভ আছে? সে অনুভব করে, দুইজন এরকম মানুষ, বিয়ের শৃপখল যাদের পরাধীন করেছে, স্বাধীন কোনও স্থানে গেলে তারা হয়ে পড়ে সবচাইতে বিপন্ন। স্ত্রী বহু দিন বলে বলে মাথা খারাপ করে ফেলতে থাকলে তারা কন্যাটিকে নিয়ে একবার বেড়াতে বেরিয়েছিল। সামনে ফিনফিনে সমুদ্র, কী তুমুল ঢেউ, সূর্যের অপার্থিব স্পর্শে ছলকে ছলকে উঠছে বাতাস, সে সেই বিস্তৃত জলরাশির সামনে প্রচণ্ড অসহায় বোধ করেছিল। দাম্পত্য জীবন তাকে প্রতি মুহূর্তে শিখিয়েছে, উপস্থিতি কত মারাত্মক হতে পারে। ঘরে স্ত্রী বা স্বামীর উপস্থিতিতে একজন মানুষ কোনও দিন প্রাণের গভীর তল থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কি নিজেকে হারাতে পেরেছে?

সমুদ্রের জাগতিক সৌন্দর্য নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে, এই ভেবে সে স্ত্রীর দিকে তাকালেই দেখে, তার স্ত্রীও এই রকম অপার জায়গায় এসেও নিজেকে হারাতে পারেনি, তার ঘাড় বাঁকানোর

ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সচেতন চোখে তাকিয়েছে তার দিকে, নিজেদের লুকাতে তারা তখন কন্যার আনন্দের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল।
সে ঘরে আসে।
খুঁটে খুঁটে সেই দৃশ্য নিয়ে ভাবে। মেয়েটির চোখে এমন ভয় ছিল, যেন সামনে তার জনক নয়, আততায়ী অথবা স্বয়ং পিস্ত্মল, এবং তার স্ত্রী যখন তাকে টেনে নিয়েছিল, মেয়েটির লুকানোর ভঙ্গির মধ্যে সে দেখেছে আশ্চর্য এক নির্ভরতা, যা সে ভাবত, তাকে কেন্দ্র করেও মেয়েটির মধ্যে দাউ দাউ বেঁচে আছে।
সে কাঁপতে কাঁপতে দেশলাই জ্বালায়। এত প্রচণ্ড ভয় কেন পেয়েছিল সে? তার করোটির মধ্যে শীত-কুয়াশা জমে তার দুই চোখ বিমূর্ত করে তোলে।
দেয়ালের আরও নিকটে এসে সে ফের দেশলাই জ্বালায়, হিবিজিবি দেয়ালে কি এঁকেছে মেয়ে? ওই তো মূর্ত হচ্ছে...। তার এমন বোধহয় যেন উল্টে যাওয়া পৃথিবীটার আকাশ খামচে ঝুলে আছে।
সে দেখে, পেন্সিলের সুতো কাটা দাগের নিচে বড় বড় দাঁতঅলা এক মুখ, বিশ্রী, কুৎসিত সেই মুখে মেয়ের আনাড়ি রেখায় সে খুঁজে পায় নিজের মুখের ছায়া...।
খোলা দরজা দিয়ে ঢোকে পাকাটে রাত্রি।
তক্ষুনি দরজায় শব্দ মিঁউ। সে অবাক হয়। কী ব্যাপার আজ কন্যার পাশ থেকে বিড়ালটি বেরিয়ে এসেছে যে! বাথরুম পেয়েছে? আঁধারে পথ ভুলে গিয়েছে? নিজের মধ্যে অ ভূত এক বিবর্তন অনুভব করে সে।
নিজেকে তার অসম্ভব নির্ভার মনে হয়।
প্রচ পুরুষত্ববোধের তলায় চাপা ছিল যে জল, হু হু রাত্রে তা তাকে ভাসাতে থাকলে সে অনুভব করে, যেন বহুকাল পর তার ঘুম পাচ্ছে।
ভোরে কন্যা খুঁজতে খুঁজতে তার দরজায় এসে থমকে দাঁড়ায়। ভয়ার্ত চোখে দেখে মেঝের মধ্যে একটি রক্তাক্ত কালো বিড়াল মরে পড়ে আছে।